দ্য নান'স্ স্টোরি

ক্যাথরিন হিউম্

ভাষান্তর

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রস্তাবনা

জীবনে অনেকবারই দেখলাম, যা ছিল আশার অতীত সেটাই হঠাৎ যেন কোন মন্ত্রবলে রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়াল, আর যা মনে হয়েছিল অনায়াসলভ্য, যে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত মনে ভেবেছিলাম ওতো হয়েই যাবে, সে আর কোনোদিনই বাস্তবের নাগাল পেল না। সে আজ কতকাল হল *দ্য নান'স্ স্টোরি* অনুবাদ করেছিলাম। বই হয়ে বেরোবে সেটা এমন একটু আশার অঙ্কুর যে দেখা দেয়নি তাও নয়, তবে সে আশা কবে কখন হারিয়ে গেল, দীর্ঘকাল তা আর মনেও পড়েনি। তাবলে উপন্যাসটা কোনোদিন হারায়নি আমার মন থেকে, হারায়নি তার প্রধান চরিত্র সিসটার লুক।

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ফিল্ম *দ্য নান'স্ স্টোরি* দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। নায়িকা সিসটার লুকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অড্রে হেপবার্ন। তাঁর টানেই তো সিনেমাটা দেখতে যাওয়া। ফিল্ম দেখার পরে ক্যাথারিন হিউমের উপন্যাসটা পড়ে ততোধিক মুগ্ধ হলাম বলব না। মনে হল যেমন সার্থক উপন্যাস, তেমনি সার্থক তার চিত্র-রূপান্তর। এ বলে আমাকে দেখো, ও বলে আমাকে।

তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হলে লম্বা ছুটি পাওয়া যেত। কোনো কাজ নেই, কিছুর জন্যে কোনো তাড়া নেই, অখণ্ড অবকাশ। আর এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে ফেলা মানে তো পড়াশোনার পাটই চুকে গেল যেন। এমনই অবসরে নিজের খেয়ালে *দ্য নান'স্ স্টোরি* অনুবাদ করেছিলাম। মাসিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের আগ্রহে সে অনুবাদ 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যা থেকে মাঘ ১৩৭১ সংখ্যা পর্যন্ত। বাংলা নাম দেবার ঝোঁকে নাম পালটেছিলাম। এবার এই অনুবাদগ্রন্থে উপন্যাসের আসল নামটাই রইল। লেখিকা ক্যাথরিন হিউমের গ্রন্থস্বত্বাধিকারীদের পক্ষে রবার্ট এন. গ্রান্ট (Robert N. Grant, Grant & Gorden LLP.CA) *দ্য নান'স্ স্টোরির* বাংলা অনুবাদ এদেশে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কিছুদিন আগে আমার ছাত্র শ্রীমান অভীক কী মনে করে পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সেই কবেকার অনুবাদ করা উপন্যাস উদ্ধার করে আনেন। এটি বই আকারে প্রকাশের ইচ্ছা এবং উদ্যোগ তাঁরই। হঠাৎ এমনি করে হাতে এসে-পড়া উপন্যাসটার পত্রিকা-প্রতিলিপি নিকটজন কেউ কেউ পড়ে দেখলেন, ভালো লাগল তাঁদের। আমিও পড়লাম। অনেকদিনের প্রিয় বই আমার, আমার তো ভালো লাগবেই। অনুবাদটাতেও তেমন কোনো রদবদলের প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না পড়তে গিয়ে। তবু দু এক জায়গায় অল্পস্বল্প কলমের ছোঁয়া লাগল শেষ পর্যন্ত।

আর একটু যদি ছোটো করা যায় ভেবে কোথাও কোথাও দু পাঁচ লাইন বাদ দিয়েছি। অনুবাদ কাহিনির সংহতিবিধানে সেটা সহায়ক হয়েছে বলে আমার ধারণা। নাহলে পঞ্চাশ বছর আগে যেমন অনুবাদ করেছিলাম, তাই রইল। এতকাল কেটে গেছে তবু এ উপন্যাসের রস মরেনি, এই আশ্চর্য। অবশ্য জানি না, এ কালের মানুষের কেমন লাগবে এ বই।

কিছু শব্দের একটি তালিকা এই গ্রন্থে দেওয়া গেল। অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয়, খ্রিস্টিয় সংঘজীবনযাপনের বিভিন্ন রীতিনীতির, সন্ন্যাসিনীদের পোশাকের, নিত্য কিংবা বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উচ্চার্য মন্ত্র ও গেয় সংগীতের পরিচয়জ্ঞাপক নাম বিষয়ক। এই উপন্যাসে এই জাতীয় যে-সব শব্দ এসেছে, অনুবাদে সেগুলি অপরিবর্তিত রাখা সমীচীন মনে হয়েছিল। এর বাইরে আরও গুটিকয়েক অন্য শব্দ রইল এই তালিকায়, এগুলিরও মূল শব্দই বাংলা বানানে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, কোনো ব্যক্তিনাম বা স্থাননাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর অন্তর্ভুক্ত হয়নি হাসপাতাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত শব্দগুলো। তার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয়নি। তবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা কিছু অসম্পূর্ণতার আশংকা শুধু এই ছোটো তালিকা সম্পর্কে কেন, সমগ্র অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পর্কেই মনের মধ্যে রয়ে গেল। কি আর করা যাবে, সাধ্যের গণ্ডি তো আর পেরিয়ে যাওয়া যায় না। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

দ্য নান'স্ স্টোরির লেখিকা ক্যাথরিন হিউম (Kathryn C. Hulme), তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁর এই উপন্যাসের ভিতর দিয়েই। তাঁর সাহিত্যজীবন সম্পর্কে সামান্যই জানি। যেটুকু জেনেছি এখানে যোগ করে দিই। ৬ জুলাই ১৯০০ ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো শহরে জন্ম তাঁর, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। বলতে ভালোবাসতেন—'I'm

a Californian'। তাঁর মায়ের সাহিত্যপ্রীতি আর বইপড়ার নেশা তাঁর উপরে বর্তেছিল এবং ঝোঁকটাও বরাবরই সাহিত্যের দিকে। কোনোদিন অন্য কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্যিক হবার অদম্য ইচ্ছাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রথম বই বেরোয় ১৯৩৮ সালে, তবে প্রথম দুটো বইকে হিউম নিজে তেমন মূল্য দিতে চাইতেন না। তখনও খুঁজে পাননি নিজের পথ। প্যারিসে তখন চাকরি সূত্রে থাকেন, সেই সময় তাঁর পরের উপন্যাস বেরোল *We Lived As Children*। শৈশবের স্মৃতিনির্ভর অল্পবিস্তর কল্পনার রঙলাগা আত্মজৈবনিক এই উপন্যাস যথেষ্ট সাফল্য ও স্বীকৃতি পেল, তাঁর সাহিত্যজীবনের পথকে আলোকিত করল। ১৯৪৫-৫১ তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিতে, ইউনাইটেড নেশন্‌সের রিলিফ অফিসার। দায়িত্বশেষে ফিরলেন আবার নিজের মধ্যে। অ্যারিজোনার ফোনিক্স শহরের রৌদ্রোজ্জ্বল নতুন আশ্রয় তাঁকে নতুন জীবন দিল। অপরিচিত শহর, কাছেপিঠে আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই, টাইপরাইটারটি কেবল সঙ্গী। পিছনে ফেলে-আসা অভিজ্ঞতার বেদনাময় স্মৃতির পটভূমিতে লিখতে আরম্ভ করলেন নতুন উপন্যাস *The Wild Place*। কিন্তু জার্মানির উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভার অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না কিছুতে। ওই ধ্বংস মৃত্যু মানুষের অবর্ণনীয় দুর্গতি— মন বলছিল অজস্র লেখা হয়েছে ওই-সব উদ্বাস্তুদের কাহিনি, আর নয়, আর এ গল্প শুনতে চায় না আমেরিকা। অথচ নিজের ভিতরকার তাগিদ তাঁকে থামতে দিচ্ছিল না, লিখেই চলেছিলেন।

প্রৌঢ় বয়সে ফোনিক্সে এসে ধর্মান্তরিত হন। অনেকদিন থেকেই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন, অবচেতনে একটা আবাল্যলালিত ব্যথা ছিল। তাঁর মা বিবাহবিচ্ছিন্না ছিলেন এবং সেজন্য সেকালে সমাজের অবজ্ঞা-অপমানের শিকার হতে হত তাঁদের। ক্যাথলিক ধর্ম বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকার করে না। একদিনের কথা, তখন বোধহয় সপ্তাহ তিনেক মাত্র কেটেছে নতুন ধর্মমতে দীক্ষা নেবার পরে, *দ্য ওয়াইল্ড প্লেস* লেখা শেষ হয়নি তখনও, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার চার্চের জেসুইট ফাদারের সঙ্গে বিকেলবেলা কথা হচ্ছিল। হিউম কথাপ্রসঙ্গে বললেন তাঁর মনে হয় এখনকার দিনে লেখকরা যদি ভেবে থাকেন যে, তাঁরা সাহিত্যরচনা করে জীবিকানির্বাহ করবেন, সেটা পাগলামি। বিশেষ করে তাঁর মতো যে লেখকরা লঘু বিষয় নিয়ে লিখতে চান না, ভারি গভীর বিষয়ের প্রতি যাঁদের আকর্ষণ, কি করবেন তাঁরা। তিনি তো তাঁর

এই বেদনাদীর্ণ গল্পটা সম্পূর্ণ করতে দিনের পর দিন পরিশ্রম করেই চলেছেন, অথচ একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না, যে এই বই বিক্রি হবে। উত্তরে ফাদার স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'মিস হিউম, আপনি সাহিত্যিক। সৃষ্টির সহজাত প্রেরণা আছে আপনার মধ্যে, আপনাকে তো লিখতেই হবে। একদিন দেখবেন, আপনার কলম ভগবদ্বাণী প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হবে।'

সেদিন চমকে উঠেছিলেন এ কথা শুনে, মন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল, নিজেকে অনধিকারী মনে করেছিল, কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে তাঁর অজান্তেই বুঝি তাঁর চেতনার ক্ষেত্রে *দ্য নান'স্ স্টোরি*র সম্ভাবনার বীজ উড়ে এসে পড়েছিল।

যথা সময়ে *দ্য ওয়াইল্ড প্লেস* প্রকাশিত হল, প্রকাশ করলেন লিটল্, ব্রাউন এন্ড কোম্পানি, বোস্টন (Little, Brown & Co. Boston)। লেখিকার সব চিন্তাভাবনা বিফল করে এই বই ১৯৫৩ সালে Atlantic Non-Fiction Award লাভ করল। এর ঠিক চার বছর পরে বেরোল *The Nun's Story*। একই প্রকাশক সংস্থা প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে, আর এক সংস্করণ বেরোয় ১৯৫৮ সালে, প্রকাশ করেন জায়ান্ট কার্ডিনাল সংস্থা (Giant Cardinal)। পকেট বুকস্ (Pocket Books Inc.) ১৯৬১তে এই বইয়ের চতুর্দশ মুদ্রণ প্রকাশ করেছিলেন, এই পর্যন্ত জানি।

দ্য নান'স্ স্টোরি প্রথম প্রকাশের পরে একটানা বাহান্ন সপ্তাহ বেস্ট সেলার হয়েছিল। সেই জেসুইট ফাদারের প্রত্যাশা কি পূর্ণ করেছিল এই বই, সফল করেছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী? প্রচার, সে যে উদ্দেশ্যবাচক হোক, সে তো সাহিত্যের ধর্ম নয়। লেখিকার মনে সে ভাবনা কোনোদিনই ছায়া ফেলে নি। লিখতে লিখতে বা পরেও কখনও 'an apostolic work'-এর কথা ভাবেন নি। এই উপন্যাসে তিনি একটি উৎসর্গীকৃত জীবনকে অভিবাদন জানাতে চেয়েছিলেন, সে কথা নিজেই বলেছেন। বলেছেন যেখানে যখনই ত্যাগব্রতী জীবন দেখেছেন, গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হয়েছেন। নিজের মাকে দেখেছিলেন মাতৃত্বের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে, তাঁর কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষা যাঁদের ব্রত ছিল, দেখেছিলেন তাঁদেরও। আর এক বেলজিয়ান নার্স, তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল জার্মানিতে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ত্রাণকর্মীদের এক ইউনিটে সে ছিল। *নান'স্ স্টোরি*র নায়িকা সিস্টার লুক তারই প্রতিরূপ। জার্মানির কুয়াশায় আবিল শীতের সুদীর্ঘ রাতগুলোয় সে তার জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনি

শুনিয়েছিল তাঁকে। সেই অসমসাহসী উৎসৃষ্ট প্রাণের শক্তির ক্রিয়া লেখিকা অনুভব করেছেন ভিতরে। বলেছেন তারই প্রেরণায় একসময় তিনি জেসুইট চার্চের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এইটুকু আত্মজৈবনিক উপাদান সংলগ্ন হয়ে রইল এই উপন্যাসে।

দ্য নান'স্ স্টোরি পাঠকসমাজে যে আশাতীত সহৃদয় অভ্যর্থনা পেয়েছিল, সেই অনুপাতেই সে বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল লেখিকার নিজের কাছে নিজের প্রত্যাশা। তারপর? তারপর একসময় যাত্রাবসান হয়ে এল পথিকের। পার্থিব জীবনের গণ্ডি পার হয়ে চলে গেলেন ক্যাথরিন হিউম ২৫ অগাস্ট ১৯৮১। কথাশিল্পীর কথা থামল, থামল তাঁর টাইপরাইটারের শব্দ।

১ বৈশাখ ১৪১৭
কলকাতা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

অনুজ্জ্বল ছোটো কালো কেপটা ঘাড়ের কাছে আটকে দিতে কনুই ছাড়িয়ে আরও একটু নীচ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এটা পরতে পরতে লুডস্ তীর্থের কথা মনে পড়ে যায় যদি, সেটা বিসদৃশ। শেষ পর্যন্ত ধর্মজীবন বেছে নেওয়ার পিছনে যেন সেই ইদানীংকার অভিজ্ঞতাটাই কাজ করেছে।

কনুই মুড়ে হাত দুটো কেপের মধ্যে একত্রিত করে এনেছে। এ পোশাকটা অবশ্য সাময়িক। ছ'মাস শিক্ষানবিশির পর নানের রোব এর জায়গা নেবে। এই হাত দুটো যখন শুশ্রূষা বা প্রার্থনার প্রয়োজনে ছাড়া দৃষ্টির অন্তরালে স্থির হয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তারপর।

মঠের সাক্ষাৎকক্ষে গ্যাব্রিয়েল ভ্যান ডি'ম্যালের সঙ্গে আরও চল্লিশটি তরুণী দাঁড়িয়ে। অধিকাংশ তার মতো বেলজিয়ান, তা ছাড়া ইংরেজ আর আইরিশ আছে ক'জন। আপাতত সবাই কেপ পরছে তারই মতো, আটকাতে ওদের কিন্তু যেন বেশি সময় লাগছে আরও। বিশেষত ক'টি খামারের মেয়ে— লাল লাল গাঁটওয়ালা আঙুলগুলো, কেপের ভাঁজে জামার আস্তিন খুঁজছে যেন।

লুডসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বারে বারেই। না, তা বলে এত সহজে ওর মনে ছাপ পড়ে না। তবু হঠাৎ মনে হল বাৎসরিক তীর্থযাত্রার হসপিটাল ট্রেনে আবার একবার চড়ে বসেছে। তীর্থযাত্রীদের স্থির বিশ্বাস যাবার পথে তারা নিশ্চয় বেঁচে থাকবে। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে রোগমুক্ত হয়ে ফিরবে। দেখতে দেখতে ভয় করছিল কেমন। নিজের নাড়িজ্ঞান, রোগনির্ণায়ক চোখ, এমনকি নাকে এসে লাগা মৃত্যুর পরিচিত গন্ধ— সবকিছু বলে দিচ্ছে কেউ কেউ সম্ভবত লুডসে পৌঁছোনো অবধিও বাঁচবে না, এমনই মুমূর্ষু অবস্থা।

থাকতে না পেরে শেষে উত্তেজিত হয়ে সিস্টার উইলিয়ামের কাছে দৌড়ে গিয়েছিল।

—চারদিকে তো দেখছি জ্বর, রক্ত পড়ছে, ক্যানসারের অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সব, তবু পাগলের মতো শুধু আশার কথাই বলছে সবাই, আর কোনো কথাই নেই কারো মুখে। আমার কামরাতেই জনা-তিনেকের জন্যে এক্ষুনি শেষ ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা দরকার সিস্টার, না হলে—

আরও কিছু বলত হয়তো, কিন্তু সিস্টার উইলিয়ামের দৃষ্টিতে কী যে ছিল, থেমে যেতে হল।

—পথে কেউ মারা যাবে না মাই চাইল্ড, কেউ তা যায় না। আমার কাছে যা শিখেছ তার বাইরেও আরও কিছু আছে— এখানে এমন অনেক কিছুই দেখতে পাবে তুমি শিগগিরই, যা অলৌকিক। তোমার মন হয়তো প্রস্তুত নয় তার জন্যে, সে ত্রুটি আমারই। যা হোক, ধর্মবিশ্বাসকে পাগলের আশা বলছিলে, মনে মনে ভগবানের নাম নাও একবার। শান্ত মনে ডিউটিতে ফিরে যাও।

এক সপ্তাহ ছিল তারা লুডসে। মনের মধ্যে তার স্মৃতি একটা বহ্ন্যুৎসবের ছবি হয়ে আছে। শুধু আলো আর আগুন, শুধু হাজার হাজার মোমবাতি আর ময়দানের ওপর ওঠা সূর্যের আলো! আর তারই সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে একটানা মর্মন্তুদ আর্তনাদ— এখনও কানে বাজে। মূল অনুষ্ঠানের দৃশ্য ভাসে চোখের সামনে— সারি সারি স্ট্রেচারগুলো সাজানো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি। মনস্ট্রেন্স হাতে ঘুরে ঘুরে আশীর্বাদ করবেন যাজক স্ট্রেচারে শায়িত মানুষগুলোকে। কখন তিনি আসেন, প্রতীক্ষা করে আছে সবাই। মনস্ট্রেন্সের সোনার ওপর সূর্যের আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। স্ট্রেচারগুলোর মাথার কাছে জ্বলছে, ক্রুশচিহ্ন যেন।

প্রত্যেকটি পৃথক স্বস্তিবচনের সঙ্গে নতুন এক-একটা কর্কশ বিকারগ্রস্ত কণ্ঠ যোগ দিচ্ছে— কেউ আর্তরবে, অনুচ্চে কেউ বা, শব্দের ঝড় বইছে যেন! ওই শব্দঝড়ের ঠেলাতেই বুঝি আলোকোজ্জ্বল মিছিলটা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে— সমুদ্রের ঢেউ যেমন করে এগিয়ে আসে বেলাভূমির দিকে, তটের বুকে আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়। তরঙ্গ কিন্তু সব শেষ মানুষটিকে অবধি আশীর্বাদ না করেও ভেঙে পড়বে না কোনোমতেই।

হে জিশু, ডেভিডের পুত্র, আমায় রোগমুক্ত করো—

সেন্ট বার্নাডেটের পুণ্যজলে স্নান করার আগে-পরে তোলা অনেকের এক্সরে প্লেটে পরিবর্তনের চিহ্ন সে নিজের চোখেই দেখেছিল। দেহতন্তুর গঠনে, এমন কী মাঝে মাঝে হাড়ের গঠনেও।

যাদের সেবার দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিল ফেরার পথে তাদেরই শুশ্রূষা করতে করতে বারবার কী অফুরন্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিল তাদের মুখের দিকে, মনে পড়ে সে কথা। এখনও রোগজীর্ণ, কাহিল মুখগুলো। তবু তৃপ্তিতে আশায় উজ্জ্বল।

দেখে বিস্ময়ের শেষ ছিল না। সিস্টার উইলিয়াম রাউন্ডে এলে বলেও ফেলেছিল।

—ওদের মনের আনন্দ দেখলে অবাক লাগে সিস্টার।

—তাই তো স্বাভাবিক, মাই চাইল্ড। আসল রোগমুক্তি তো সেটাই। ডাক্তারদের সঙ্গে মন দিয়ে এক্সরে প্লেটগুলো দেখো তুমি। আমি দেখেছি— ফিল্মে যেটুকু ধরা পড়ে ডাক্তাররা তাই দেখেন কেবল। আসল হল এই— নিস্তব্ধ স্লিপিং কামরাটার দিকে চেয়ে এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নোয়ালেন যেন জিশুর নাম শুনেছেন, এই হল ভগবানের প্রকৃত করুণা— প্রত্যক্ষগোচর একেবারে, বিশ্বাসীমাত্রেই এ করুণার ভাগীদার।

তার জামার আস্তিন ধরে আস্তে একটু টেনেছিলেন সিস্টার উইলিয়াম। গ্যাব্রিয়েল নানদের কাছেই মানুষ হয়েছে, জানে নানরা কেউ কাউকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকেন না, প্রয়োজনে জামার আস্তিন ধরে একটু টানেন কেবল।

সিস্টার উইলিয়াম পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে ক'দিন আগে তারই বলা কথাটাই হঠাৎ শুনিয়েছিলেন তাকে, 'পাগলের মতো আশা'। কথাটায় ইঙ্গিত ছিল একটা, সেটা ভালো লাগেনি। কিন্তু জামার আস্তিনে টানটা আরও অস্বাভাবিক। নানদের মধ্যে প্রচলিত মনোযোগ আকর্ষণের ভাষা এটা, বাইরের সাধারণ মানুষের প্রতি প্রয়োগের রীতি নেই। গ্যাব্রিয়েলের বিস্ময়ও তাই, সে-ও যেন ওঁদেরই একজন।

আর এখন সত্যিই তাঁদেরই একজন সে। কিংবা হল বলে।

সাক্ষাৎকক্ষে সঙ্গিনী আর যারা রয়েছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আত্মচিন্তার ছাপ তাদের মুখে। উত্তেজিত, একটু ভয়ও পেয়েছে। আন্দাজ করা কঠিন নয়, ব্রাসেলসের এই কনভেন্টটির বাইরের ঘরে এনে দাঁড় করাল যে ঘটনাপরম্পরা, মনের মধ্যে ওদের তারই পর্যায়গুলো রোমন্থন চলছে।

গ্যাব্রিয়েলও নিজের ধাপগুলো ভাবছে পরপর। ছেলেবেলায় রাঁধুনি ফ্রান্সিসকে দেখত— বড়ো গোল পাঁউরুটির ওপর প্রথমে ছুরি ঠুকে ক্রুশচিহ্ন না করে নিয়ে সে কখনও রুটি কাটত না। শিশু গ্যাব্রিয়েল এই রুটি কাটার ধর্মানুষ্ঠান দেখত, তার সঙ্গে ম্যাসে যোগ দিত রোজ। অবশ্য মর্মার্থ উপলব্ধি করে নয় যদিচ, অন্য কারণে। ওই যে ব্রাহ্মমুহূর্তে মোমবাতির আলোয় গান গাওয়া, ওই যে বড়োরা

জিভে ওয়েফারটুকু না ঠেকিয়ে প্রাতরাশ খান না, তার শিশুমন অনেকখানি বিস্ময়ের সন্ধান পেত, অনেকখানি রহস্যেরও।

বাবা তার ডাক্তার, তাঁর সঙ্গে অনেক পুরোনো আমলের বাড়িতে গেছে সে। সব বাড়িতেই দেখত দেওয়ালে একটা বিরাট পুরোনো ধাঁচের জপমালা ঝোলানো। আর তারই নীচের দিকে ক্রুশবিদ্ধ জিশুমূর্তি একটি। তাৎপর্য, হৃদয়ের মধ্যে জিশু বিরাজিত সর্বদা। ঈশ্বরভক্তির এমন বাহ্যিক প্রকাশ এখন আর দেখা যায় না। রোগী দেখার কাজে ঘোরাঘুরি শেষ করে বাবা যে সব গাঁয়ের কাফেতে বসে সামান্য কিছু খেয়ে জিরিয়ে নিতেন, সেখানে দস্তার পাতের ওপর একটা ত্রিকোণের মধ্যে বিশাল একটা চোখ আঁকা থাকত। এখনকার দিনে সেরকম আর দেখা যায় না। মনে আছে, বাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওই জবরদস্ত অদ্ভুত চিহ্নটার অর্থ হল এ জায়গার ওপর ভগবানের দৃষ্টি রয়েছে সর্বদা। দিব্যিটিব্যি দেওয়া এখানে চলবে না।

পুরোনো ধাঁচের ছেলেবেলা, ধর্মভিত্তিক। ঈশ্বর যেন তাদের পরিবারের একজন ছিলেন। আমি যে এখানে এলাম তার প্রধান কারণ সেটাই। খুব ছোটো ছিলাম যখন, তখনই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শিখেছি— জন কোথায় তখন, তার সঙ্গে আলাপ হবারও আগে— অনেক অনেক আগে—

দৃঢ়সংবদ্ধ হাত দুটো বুকের কাছে চেপে ধরে পসচুল্যান্টদের মিস্ট্রেসের কঠোর সুন্দর মুখের দিকে দেখছিল চেয়ে চেয়ে। লোকে বলে, যদি কখনও ছাপা রেকর্ড থেকে অর্ডারের হোলি রুল নষ্ট হয়ে যায় কী হারিয়ে যায়, এইসব নানদের বিশ্লেষণ করে তার কমা-সেমিকোলনটি অবধি আবার উদ্ধার করতে পারা যাবে। ওঁরাই মূর্তিমতী নিয়ম। ও মুখে কালের ছাপ পড়ে না। মুখ ফিরিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছেন তাঁর পসচুল্যান্টরা প্রত্যেকে চুলের ওপর ভেলটা পিন দিয়ে ঠিক আটকেছে কিনা, কেপটা পরেছে কিনা ঠিকমতো। কথা বলতে শুরু করলেন তারপর। পরিমিত কণ্ঠস্বর, ঠিক ওই কেপে ঢাকা দলটার শেষ মেয়েটি অবধি শুনতে পাবে, তাকে ছাড়িয়ে আর কেউ নয়।

—এখন চ্যাপেলে যাব আমরা, ঈশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলব একটু। ঘুরে একটা ভারী ওক কাঠের দরজা খুললেন। এমন সাবলীল ভঙ্গি যেন দরজাটা কাঠের নয়, তুলোর তৈরি, শব্দসাড়া হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। গ্যাব্রিয়েল দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা হাত তাঁর কেমন করে চামড়ার বেল্টে আটকানো চাবির গোছার ওপর এসে পড়ল, চলতে গিয়ে যাতে চাবিগুলো ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ না হয়।

—তোমরা জোড়ায় জোড়ায় আমার পিছনে এসো। আমরা চোখ নীচু করে চলি, আমাদের হাত দেখা যায় না।

ব্র্যাকেটের মধ্যে মোমবাতিগুলো ধূম উদ্‌গিরণ করছে নিঃশব্দে, করিডর ধরে ধীর পদক্ষেপে সেই দিকেই এগোলেন।

যেতে যেতে দর্শনার্থীদের বসবার ঘরটার ছোট্ট দরজাটার দিকে গ্যাব্রিয়েল শেষবারের মতো তাকাল। এইমাত্র সেখানে সবাই বাড়ির লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছে। বাবা হয়তো এখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। দাঁড়িয়ে শক্ত ভারী হাতে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন ধীরে ধীরে। বেলজিয়ামের ডাকসাইটে চেস্ট সার্জন ও হার্ট স্পেশালিস্ট। চিনতে পেরে নমস্কার করছেন যাঁরা, প্রতিনমস্কার করছেন তাঁদের। ভান করছেন একমাত্র কন্যাকে ভগবানের চরণে অর্পণ করে অন্যদের মতো তিনিও গর্বিত।

বিদায় দেবার সময় মোটা বুড়ো আঙুলটা দিয়ে ক্রুশচিহ্ন করে দিয়েছেন কপালে, স্পর্শটুকু এখনও অনুভব করা যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় বড়ো হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলেন, বাইরের জগতে সেই শেষ খাওয়া। জিল্যান্ডের চমৎকার মাংসল অয়েস্টার ছিল, বাবাই বিশেষ করে অর্ডার দিয়েছিলেন, স্বাদটা এখনও লেগে আছে মুখে। সফেন রুডেশাইমার মদ, কিনতে অন্ততপক্ষে পাঁচজন রোগীর ভিজিট লেগেছিল। তার প্রিয় আইসক্রিম ছিল, খুব বেশি করে বাদাম দেওয়া, চকচকে ভাঙা ভাঙা বাদামগুলো। কনভেন্টে ঢোকায় বাবার অমত ছিল, অথচ বুঝিয়ে নিরস্ত করবার মতো যুক্তি খুঁজে পাননি। যে কথা বলে বোঝাতে পারেননি, জীবনের সব প্রলোভনের বস্তুগুলোকে জুটিয়ে এনেছিলেন সেই কথাই বলতে, বাবাকে শেষ বারের মতো জামায় ন্যাপকিন গুঁজতে দেখেছে গ্যাব্রিয়েল সেদিন। দেখেছে মদের বোতলের ছিপি শুঁকে তবে ওয়েটারকে ঢালতে দিচ্ছেন, সারা মুখে ভোজনরসিকের তৃপ্তি মাখা। বাবা বোঝেননি প্রকৃত বেদনা তাকে এইগুলো দিয়েই দিচ্ছেন— তাঁর চিরপরিচিত হাবভাব, খুঁটিনাটি অভ্যাসগুলো চোখে পড়েছে যত বুকটা মুচড়ে উঠেছে যন্ত্রণায়, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত পরীক্ষা করলে যন্ত্রণা হয় যেমন।

কফি খেতে খেতে বাবার ধূমপানের নলটা দেখছিল শেষবারের মতো। সাবানের ফেনার মতো সাদা হালকা ধরনের পাথরে তৈরি নলটা— অনেক দিনের হল, ভালোবাসেন বলে বাবা ব্যবহারও করেছেন বেশি— তামাটে হয়ে গেছে। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে বাবা তাকিয়ে আছেন তার দিকে, ডাক্তারি সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন, যেন তাঁর সহকর্মী সে। ওই নীল চোখ দুটিও এই শেষবারের মতো দেখেছে গ্যাব্রিয়েল। একবারও কনভেন্টের নামোল্লেখ করেননি, তাকেও বলবার